বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি সমীক্ষা

—মোঃ বদিউজ্জামান

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবেন।" এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার প্রথম হতেই নতুন আঙ্গিকে প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে আরো গতিশীল করার প্রয়াস চলে আসছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন কোন উপনিবেশ নয়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বিদেশী প্রভুদের তুষ্ট করাই প্রশাসনের মুখ্য লক্ষ্য থাকে কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য থাকে জনগণের কল্যাণ সাধন। যেহেতু প্রশাসন জনগণের জন্য সুতরাং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নেয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বাংলাদেশে। এ কার্যক্রম কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে এবং যাদের স্বার্থে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তারা কতটুকু উপকৃত বা লাভবান হয়েছে বা তাদের অবস্থার তথা সমাজের কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের আমলে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আলোচিত এবং সমালোচিত বিষয় হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা বণ্টন (DEVOLUTION) পদ্ধতিতে সৃষ্ট উপজেলা পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করাও প্রবন্ধের আর একটি লক্ষ্য।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ লেখায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করা হবে। এ লেখার লক্ষ্যসমূহ মনে রেখেই বাংলাদেশ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ করে উপজেলা পদ্ধতি পত্তন, গোড়ার কথা এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা করা হবে। অবশ্য প্রাসংগিকভাবে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অন্যান্য দিকগুলোও আলোচনায় থাকবে তবে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় এ স্বল্প পরিসরে।। উপসংহারসহ উপজেলা পদ্ধতির উপর কয়েকটি সুপারিশ থাকবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি তাত্ত্বিক ধারণা

বর্তমানে বিকেন্দ্রীকরণের এক বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে এ প্রক্রিয়া চলছে। প্রত্যেক ধরনের সরকারই বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একবার ভাবে। কোন দেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত দিক বিবেচনা করে ঐ দেশের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তারা তাদের মত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। আবার একই প্রক্রিয়াকে অন্যেরা হয়তো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

আধুনিক বিশ্বে প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নততর দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের সংগে যোগাযোগ করতে হয়, প্রশাসনের স্বার্থে সরকারী বিভিন্ন এজেন্সীসমূহ, বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারের এমন কতগুলো কাজ যেমন–রাজস্ব আদায় আইন শৃংখলা বিধান, ভূমি নিবন্ধন, কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্ম আছে যা রাজধানী হতে সমাধান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন করে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কথা বলা হয়ে থাকে যা মূলতঃ রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে সমতা আনয়নে সহায়তা করে। কিন্তু সরকারী কাঠামোর অংশ হিসেবে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন তখনই টিকে থাকতে পারে যখন উন্নয়ন হয় এর ভিত্তি। রাজনৈতিক ও সরকার পরিবর্তন হলেও বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির স্বার্থে সম্পর্ক থাকার কারণে একে পরিবর্তন করা যায় না। এ জন্য হয়তো বিভিন্ন অনুন্নত দেশের অনভিজ্ঞ সরকারগুলো কেন্দ্রে দৃঢ় ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারের তুলনায় বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে। দেখা যায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের আমলেই শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের/জনগণের অংশ গ্রহণ ও সম্পদের আহরণ সম্ভব। অনুন্নত দেশগুলোতে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে সরকার সাধারণতঃ দুর্বল হয় এবং ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বিকেন্দ্রীকরণকে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেয়া হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পন্থার মাধ্যমে একটি জাতি যত বেশী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা অর্জন করে ততবেশী সেখানে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। এক দলীয় সরকারের প্রশাসন যন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে মত পার্থক্য কম থাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বটে কিন্তু ঐক্যমত সম্পন্ন বহু দলভিত্তিক স্থিতিশীল নিরবচ্ছিন্ন রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ভীতি ডিঙিয়ে যেতে পারে তখন শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মের অখণ্ড অংশ হিসেবে ধরে নিতে পারে। আমলাতন্ত্রের বৈরী সূলভ দৃষ্টিভংগি এতে অনেকটা অতিক্রান্ত হবে। উন্নয়নশীল দেশে এ অবস্থা আনয়ন সময় সাপেক্ষ, কিন্তু এটাই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণের পথকে সুগম করতে পারে।

ধারণা ও পদ্ধতি হিসেবে জেমস ডব্লিউ কেসলার বিকেন্দ্রীকরণকে একটি জটিল বিষয় বলে মনে করেন। এ জটিলতাকে বোঝার জন্য কেসলার চার দৃষ্টিকোণ থেকে বিকেন্দ্রীকরণকে দেখার চেষ্টা করেন–মতবাদ হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণ, একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে, একটি প্রশাসনিক

সমস্যা হিসেবে এবং সরকারী কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধি সহকারে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে। [২] ডায়না কনিয়ার্স মনে করেন "বিশ্লেষণমূলক সমস্যাদি বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে ঘিরে থাকার ফলে বিকেন্দ্রীকরণের উপর কোন আলোচনা যে কোন সময় এলোমেলো হয়ে যেতে পারে [৩]" কনিয়ার্স ডি, এ রণ্ডিনেলী প্রদত্ত সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। রণ্ডিনেলীর মতে "পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গণকার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।" [৪] কনিয়ার্স মনে করেন বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর প্রসংগে ব্যবহৃত বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটির সংগে এ সংজ্ঞা সংগতিপূর্ণ, তবে জাতীয় ও সরকারী পর্যায় থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক, স্থানীয় ও বেসরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ বহুবিধ সাংগঠনিক পরিবর্তনের সংগে যুক্ত হয়ে অনেক রূপ ধারণ করতে পারে। [৫]

বিকেন্দ্রীকরণের ধরণ ঃ যেহেতু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিকেন্দ্রীকরণ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় তাই সঠিকভাবে একে শ্রেণীভূক্ত করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তবে বিকেন্দ্রীকরণকে শ্রেণী বিন্যাস করতে কনিয়ার্স এর মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) যে ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ;
(খ) প্রতিটি ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর হস্তান্তরিত ক্ষমতার প্রকৃত ধরণ ;
(গ) যে পর্যায় স্তর এবং এলাকায় এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ;
(ঘ) এরূপ ক্ষমতা প্রতিটি পর্যায়, স্তর এবং এলাকায় অবস্থিত যে সব ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হয়েছে,
(ঙ) যে সব আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। [৬]

রণ্ডিনেলী এবং অন্যান্যরা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য চার ধরনের বিকেন্দ্রীকরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন– যেমন বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিনিধি প্রেরণ (delegation), ক্ষমতা বণ্টন (devolution) এবং ব্যক্তিগতকরণ। কোন কোন সরকার চারটি পদ্ধতিকে একই সময়ে বা কোন সরকার বিভিন্ন সময়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কেসলার অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণের ধরনের উপর আস্থাশীল নন। তবে তিনি বিকেন্দ্রীকরণ বুঝাতে ক্ষমতা বণ্টন (devolution) ও বিপুঞ্জিভূতকরণ (deconcentration) ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ বিকেন্দ্রীকরণকে আবার এভাবেও ভাগ করেছেন যেমন ঃ বিপুঞ্জিভূতকরণ, প্রতিনিধি প্রেরণ, ক্ষমতা বণ্টন, ব্যক্তিগতকরণ, এগুলো কোন না কোন ভাবে জনগণের অংশগ্রহণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ আহরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অধুনা সর্বশেষ যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তা হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ধরণ হিসেবে ক্ষমতা বণ্টন, বিপুঞ্জিভূতকরণ, প্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্যক্তিগতকরণ দ্বারা বিকেন্দ্রীকরনের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারে না। রণ্ডিনেলী মনে করেন বিকেন্দ্রীকরণ মূলতঃ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে এবং এর বাস্তবায়ন ও সেখানকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। প্রশ্ন আসতে পারে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া তাহলে কিভাবে বাস্তবায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে কনিয়ার্স মনে করেন জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়

প্রথাতেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে যে, কোন্ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে' বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে আর কোন্ ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক হস্তান্তরের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য আছে। [৭]

বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধরন এবং এর বাস্তবরূপ

প্রত্যেক দেশেই সরকারের কাঠামো প্রায়শঃই পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন কখনো প্রশাসনিক সংস্থারও পুনর্গঠনের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে আবার কখনো সামাজিক, প্রশাসনকি ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ পরিবর্তনের ফলাফল যতবেশী চোখে পড়ে উন্নত দেশে তত নয় কারণ উন্নয়নশীল দেশে সরকারই সধারণতঃ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। [৮] বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যতগুলো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সবকটিতেই মূলতঃ বিভিন্ন সরকার মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যেহেতু বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় অথবা যদি অনুন্নত দেশ বলেও আখ্যায়িত করা হয় তবুও এখানে বিকেন্দ্রীকরণের সব পদক্ষেপই সকলের নজরে পড়ে। এ প্রক্রিয়া বৃটিশ আমল থেকেই, এমনকি আরো আগে থেকেই চলে আসছে। যেহেতু বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হবে তাই এখানে মতবাদের আলোকে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কিছু ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

আমরা দেখেছি বিকেন্দ্রীকরণ সাধারণতঃ চার পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায় ঃ যেমন Deconcentration বা বিপুঞ্জিভূতকরণ, Delegation বা প্রতিনিধিত্ব প্রক্রিয়া ও Devolution বা ক্ষমতা অর্পন এবং Privatisation or Transfer of functions from public to non-government organizations বা ব্যক্তিগতকরণ অথবা সরকার হতে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কার্য বন্টন। কোন কোন দেশে এর দু'একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে আবার কোন কোন দেশে সবকটি পদ্ধতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ শেষোক্ত দলেরই একটি। অর্থাৎ এখানে চারটি পদ্ধতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশে কেন্দ্র শাসিত পদ্ধতির সরকার বর্তমান। তাই কেন্দ্র হতেই সব আদেশ নির্দেশ জারী হয়ে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, কিন্তু প্রশাসনের সুবিধার জন্য কাজের ভার সরকারের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দ্বারাই পালন করতে হয়। যদিও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সমস্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা বিপুঞ্জিভূতকরণ প্রক্রিয়া বহুলাংশে সাধিত হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে মোট ১৯টি জেলা ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পর্যায় ক্রমে প্রথমে ২১টিতে এবং পরে ৬৪টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারাও জেলায় নিজ নিজ বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা প্রশাসক প্রধানতঃ সকল বিভাগের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। অবশ্য জেলা প্রশাসকের এ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে

বর্তমানে বহু আলোচনা সমালোচনা আছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি লংঘন না করে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আর একটি পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় যা প্রতিনিধিত্ব প্রক্রিয়া নামে লোক প্রশাসন ভাষায় অবহিত। এ প্রক্রিয়া আবার দু'ধরনের হয় ঃ স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্তকর্তাদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা প্রদান করা।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই এক বা একাধিক স্বায়ত্ত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও দপ্তর আছে। এ সব সংস্থার প্রায় সকলের নিজস্ব নিয়ম কানুন ও কর্ম পদ্ধতি আছে। সরকারের মূলনীতির সংগে সংগতি রেখে তারা নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে। এ সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো কেন্দ্রীয় সরকারকেই মূলতঃ প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্যদিকে কাজের সুবিধার জন্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলো তাদের কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেন কাজে গতিশীলতা আনয়ন করার জন্য। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। এ ছাড়া কোন কোন মন্ত্রণালয় তার কিছু কিছু ক্ষমতা কাজের সুবিধার্থে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কেও ব্যবহার করার জন্য দিয়ে থাকে।

বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর / অর্পন বা Devolution। স্থানীয় পর্যায়ে সম্পাদন করা যায় এমন কতকগুলি কার্যভার ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কাছে অর্পন করে থাকে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ (১) স্থানীয় সংস্থাগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন, যার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ নেই; (২) এ ধরনের স্থানীয় সরকারগুলোর ভৌগোলিক সীমারেখা আছে যার মধ্যে তারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে; (৩) স্থানীয় সরকারগুলো আইনসিদ্ধ সংস্থার মর্যাদা সম্পন্ন এবং নিজেরাই সম্পদ আহরনের ক্ষমতা রাখে; (৪) এ পদ্ধতি দ্বারা স্থানীয় সরকারকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যা হতে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হয়, এবং (৫) এ প্রক্রিয়া দ্বারা স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এক যোগসূত্র, সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপজেলা পদ্ধতি চালু করা হয়। ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে উপজেলা পদ্ধতিতে রূপ নিয়েছে নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণের ৪র্থ পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিগতকরণ বা বেসরকারী সংস্থার নিকট কার্য ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ অর্থাৎ Privatisation or transfer of functions from government to NGOs. পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও অনেক দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে যা জনসাধারণের স্বার্থেই করা হয়। এ সকল সংস্থাগুলো সাধারনতঃ সেবা কেন্দ্রিক কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশে গত দু'দশক ধরে বেসরকারী সংস্থাসমূহ গ্রামের দরিদ্র জনগণের সেবায় নিয়োজিত আছে। স্বাধীনতার পর এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। সরকারের নিকট রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী সংস্থার সংখ্যা ৮০০০ এর বেশী। এর মধ্যে আবার প্রায় ২০০

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রতিষ্ঠান বিদেশী উৎস থেকে সাহায্য পায়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপকতার ফলেই মূলতঃ বেসরকারী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সাধারণতঃ ৫ ধরনের বেসরকারী সংস্থা আছে যেমন ঃ (১) দাতা সংস্থা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এধরনের সংস্থা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সাহায্য দিয়ে থাকে, যেমন— অক্সফাম ; (২) কিছু আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা আছে যারা বাংলাদেশে সরাসরি উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে, যেমন—কেয়ার, হডী, এম সি সি, ইত্যাদি ; (৩) দেশীয় বেসরকারী সংস্থা যারা দেশের বিভিন্ন অংশে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সংগঠিত করছে ; এদের মধ্যে আছে 'ব্রাক', 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র', 'প্রশিকা','নিজেরা করি', ইত্যাদি ; (৪) কিছু বেসরকারী সংস্থা আছে যারা স্বল্প এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, এবং (৫) কিছু বেসরকারী সংস্থা আছে যারা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করে থাকে, যেমন বাংলাদেশ উন্নয়ন সমিতি বা এডাব, স্বেচ্ছামূলক স্বাস্থ্য সেবা সমিতি। প্রশাসনের সুবিধার জন্য এবং অর্থনৈতিক কারণে অনেক কল-কারখানা যা পূর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল তা অধুনা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। এ সমস্ত শিল্প বা কল-কারখানার দায়-দায়িত্ব বেসরকারী পর্যায়ে দেয়া হচ্ছে যাকে লোক প্রশাসনের ভাষায় ব্যক্তিগতকরণ পদ্ধতি বা Privatization বলা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে বিকেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারী ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

লিটল রিপাবলিক ঃ পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারণা একেবারে নতুন নয়। ইতিহাস হতে দেখা যায় মৌর্য যুগে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল। গ্রাম্য প্রশাসন পদ্ধতির একটি পরিষ্কার বাংলা পওয়া যায় 'ধর্মসূত্রে' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'। একটি গ্রাম একটি পঞ্চায়েতের অধীন ছিল যার প্রধান ছিল 'গ্রাম স্বামী' বা 'গ্রামীন' পঞ্চায়েতে ৫ জন সদস্য ছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল শত্রুর হাত হতে গ্রাম এবং জনগণের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা। এর একটি গঠনতন্ত্র ছিল। পঞ্চায়েত ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করতো এবং গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি কার্যাদিও দেখাশুনা করতো।[৮] উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু রাজনৈতিক উত্থান পতন দেখেছে কিন্তু এদের অনেকগুলো বহুদিন পর্যন্ত নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এতই কার্যকরী ছিল যে ইংরেজ লেখক স্যার চার্লস মেটকাফ (১৮১১-১৮১৯) এদেরকে 'লিটল রিপাবলিক' নামে অভিহিত করেছিলেন।

ইংরেজ আমল ঃ বর্তমানে স্থানীয় সরকার যে অবস্থায় আছে তার ইতিহাস খোঁজ করতে হলে আমাদেরকে এ উপমহাদেশে বৃটিশ প্রশসন পদ্ধতির দিকে ফিরে যেতে হয়। বর্তমান বাংলাদেশ ইংরেজ উপনিবেশ যুগে 'বাংলা প্রদেশ' নামে ছিল। অনেকে আছেন যারা বর্তমানে আমাদের দূর্ভাগ্যের জন্য ইংরেজকে দায়ী করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখলে দেখা যাবে ইংরেজরা এদেশে শুধু একটি সহজ শিক্ষা পদ্ধতি, একটি সুন্দর বিচার পদ্ধতিই চালু করে যায়নি সংগে সংগে

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পদ্ধতির ধারণাও চালু করেছিল। বেংগল লোকাল সেলফ গভঃ এক্ট ১৮৮৫ (দি বেংগল এক্ট ৩, ১৮৮৫) এর মাধ্যমে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। একই ভাবে জেলা বোর্ডও গঠন করা হয়। মহকুমা পর্যায়েও এ ধরনের সংস্থা গঠন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় কিন্তু তা গঠন করা সম্ভব হয়নি। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্যোগেই মূলতঃ এ আইন পাশ করা হয়। এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল দায়িত্ব ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক), হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখাশুনা করা, পূর্ত কর্মসূচী, বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯২০ এর দিকে দু'টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রথমতঃ এক বা একাধিক থানা নিয়ে সার্কেল গঠন করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ড সমূহকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত অন্ততঃ জেলা বোর্ডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। এদেশীয়দেরকে মূলতঃ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

পৌর সভার গোড়ার কথা–পল্লী এলাকায় স্থানীয় সরকারের তথা প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে শহর এলাকায় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়ের পূর্বেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে ব্যবসা করছিল তখন হতেই এর কর্মচারীদেরকে শহর এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করার জন্য উৎসাহ দিত। এগুলো তখন 'সাদা শহর' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪২ খৃঃ সর্ব প্রথম ১০ নং আইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে টাউন কমিটি করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫০ সনে ১৬ নং আইন পাশ করা হয় যার দ্বারা এ অঞ্চলে প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে ১৮৫৬ খৃঃ নাসিরাবাদ, ১৮৬১ খৃ শেরপুর, ১৮৬৪ খৃঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং ১৮৬৮ খৃঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা গঠন করা হয়। ১৮৯০ খৃঃ পর্যন্ত সকল পৌরসভায় সরকারী কর্মকর্তাগণই প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। ১৮৯০ সনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সনে বেংগল মিউনিসিপ্যাল এক্ট পাশ করা হয় যা দ্বারা ১৯৬০ সন পর্যন্ত পৌরসভাগুলো পরিচালিত হত। ১৯৬০ সনে পৌর প্রশাসন অর্ডিনেন্স জারী করা হয়। এ আইন দ্বারা পুনঃ সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পৌরসভাগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

১৯৭৩ সনে বাংলাদেশে প্রথম পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সনে এ দেশে পৌর প্রশাসনে আর এক নতুন ধারা সৃষ্টি করা হয়। চারটি বিভাগীয় শহরের পৌরসভাগুলোকে পর্যায়ক্রমে পৌর কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করা হয়। [৯] বাংলাদেশে বর্তমানে পৌরসভা / পৌর কর্পোরেশনের সংখ্যা নিম্নরূপ [১৩] ঃ-

প্রকার ভেদ	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট আইন
১. পৌরসভা		পৌরসভা অর্ডিনেন্স ১৯৭৭
ক) ১ম শ্রেণী	১২	ঐ
খ) ২য় শ্রেণী	৩০	ঐ
গ) ৩য় শ্রেণী	৪২	ঐ

২। পৌর কর্পোরেশন

ক) ঢাকা পৌর কর্পোরেশন		ঢাকা পৌর কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স '৮৩		
খ) চট্টগ্রাম	ঐ	চট্টগ্রাম	ঐ	'৮২
গ) খুলনা	ঐ	খুলনা	ঐ	'৮৫
ঘ) রাজশাহী	ঐ	রাজশাহী	ঐ	'৮৭

দেখা যায় পল্লী এলাকার সাথে সাথে শহর অঞ্চলেও ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কোন সময় এটি সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রনে যায় আবার কখনো নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ১৯৮৪ সনের এক আদেশ বলে পৌরসভাগুলোকে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের হাত হতে সরিয়ে নেয়া হয়। পৌর এলাকায় উন্নয়ন সাধনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পৌর কর্তৃপক্ষকে দেখতে হয়। সরকার হতে অনুদান এবং স্থানীয়ভাবে কর আদায়ের মাধ্যমে এর সম্পদ আহরন করা হয়। সরকারী নীতির মধ্যে থেকে নিজেরাই বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে থাকে।

পাকিস্তান আমল ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরও বৃটিশ যুগে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি যেভাবে চলতো তাতে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বিপুজ্ঞিভূতকরণ ও ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার বিষয়াবলী পাওয়া যায়। দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (যা বর্তমানে বাংলাদেশ) নিম্নোল্লিখিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ঃ

১। জেলা বোর্ড ১৫টি (প্রত্যেক জেলায় একটি)
২। ইউনিয়ন বোর্ড - ৩৫৮১
৩। মিউনিসিপ্যাল বোর্ড - ৪৩

১৯৫৮ সনে তৎকালীন পাকিস্তানে জেনারেল মোঃ আইউব খান ক্ষমতায় আসার পর স্থানীয় সরকার গঠন পদ্ধতি পুনরায় ১৯২০ সনের নিয়ম অনুযায়ী প্রবর্তন করেন অর্থাৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশে। 'কুমিল্লা পদ্ধতি'কে

অনুসরণ করে থানা কাউন্সিল গঠন করা হয় যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। মহকুমা প্রশাসককে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সীমিত আকারে এ কাউন্সিল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো। জেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মত থানা কাউন্সিল কোন ট্যাক্স আদায় করতে পারতো না। প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্রে' ৪টি স্তর ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। মৌলিক গণতন্ত্রে একটি কাঠামোর চিত্র ৪·১ এ দেখান হলো। ১৯৬৯ সনে প্রবল আন্দোলনের মুখে আইউব খান ক্ষমতা হতে সরে দাঁড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রেরও অবলুপ্তি ঘটে।

চিত্র ৪·১

১৯৬২ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো

বিভাগীয় কাউন্সিল –৪

চেয়ারম্যান	সদস্য	কমিশনার
সরকারী কর্মকর্তা ৫০% বা কম		বেসরকারী সদস্য ৫% বা তার বেশী

জেলা কাউন্সিল –১৭

চেয়ারম্যান	সদস্য	ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক
ভাইস চেয়ারম্যান		নির্বাচিত সদস্যগণ
সরকারী কর্মকর্তা ৫০% বা কম		নির্বাচিত সদস্য ৫০% বা বেশী

থানা কাউন্সিল –৩৯৬

চেয়ারম্যান	সদস্য	মহকুমা প্রশাসক
ভাইস চেয়ারম্যান		সার্কেল অফিসার
সরকারী কর্মকর্তা		টাউন কমিটি ও ইউ, সি'র নির্বাচিত
৫০% বা কম		চেয়ারম্যানগণ ৫০% বা বেশী

ইউনিয়ন কাউন্সিল – ৪০৩২

চেয়ারম্যান— নির্বাচিত
সদস্য – নির্বাচিত

সূত্র ঃ প্রশাসনিক পুর্নগঠন/ সংস্কার কমিটির (১৯৮২) রিপোর্ট হতে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

বাংলাদেশ আমল ঃ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন থানা ও জেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং গৃহীত সংবিধানেও স্থানীয় সরকারের কথা বিশেষভাবে বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে থানা ও জেলা পর্যায়ে এর অস্তিত্ব সরকারী দলিল দস্তাবেজের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়।

১৯৭৫ সনে দেশে সংবিধানে সংশোধন ঘটিয়ে প্রশাসনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। সকল মহকুমাকে জেলা ঘোষণা করা হয় এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে জেলা গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। জেলা গভর্ণরদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ এবং কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মকর্তা। কিন্তু এ পদ্ধতি পরীক্ষিত হয়নি। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হয় এবং গভর্ণর পদ্ধতি বাতিল করা হয়। অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন এবং থানা ও জেলা পরিষদ পুনঃ চালু করেন। এ সময় গ্রাম পর্যায়ে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'গ্রাম সরকার' গঠন, করা হয় যার সদস্যগণ মনোনীত ছিলেন। ১৯৮১ সনে জেঃ জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ১৯৮২ সনের ২৪ শে মার্চ জেঃ এরশাদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন এবং স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। দেশে ক্ষমতা বন্টন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক ব্যাপক কর্মসূচীর সূচনা করা হয়। তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল এম, এ খানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় The Committee for Administrative Reorganization & Reforms, যেটির অনুসন্ধেয় বিষয় ছিল ঃ

(১) জনগণের সেবায় নিয়োজিত বেসামরিক প্রশাসনের গঠন প্রকৃতি পর্যালোচনা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা ;

(২) ক্ষমতা বন্টন পদ্ধতির আলোকে এমন একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুপারিশ করা যাতে প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া যায়।[১০] তবে এ কমিটির কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে ইতিপূর্বে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য পূর্ববর্তী সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছিল তা সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই প্রশাসনের পুনর্গঠন অনিবার্য কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত এটি ছিল একটি প্রদেশ এবং সচিবালয় ও অন্যান্য অফিসের কর্মপদ্ধতি প্রাদেশিক ধাঁচের ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কিছু অফিস ছিল। একটি সার্বভৌম দেশের জন্য যে ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো দরকার তা ছিল না। অন্যদিকে তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন সমস্যাদি অতি জরুরী ছিল। এ সমস্ত অসুবিধাদি দূরীকরণের জন্য সুপারিশমালা পেশ করার জন্য তৎকালীন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুজ্জামান-এর নেতৃত্বে বেসামরিক প্রশাসন পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করা হয়। যদিও এটি একটি অন্তবর্তী কমিটি ছিল, তবুও সরকার এর রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং জাতীয় সচিবালয় পুনর্গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে বেসামরিক প্রশাসন উন্নয়নের সুপারিশ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সনের ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রশাসনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক সুপারিশমালা পেশ করার জন্য গঠন করা হয় 'চাকুরী ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি' যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য জনাব মুজাফফর আহমদ চৌধুরী। এ কমিটি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণসহ স্থানীয় সরকার গঠন, চাকুরীর ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কাছে অধিক ক্ষমতা বন্টনের জন্য সুপারিশ করেন এবং জাতীয় ও স্থানীয় সরকারসমূহের কাজের সুবিধার জন্য সুনির্দিষ্ট সীমারেখাও সুপারিশ করেন। চৌধুরী কমিটি কাজের সুবিধার্থে মহকুমা প্রশাসন উঠিয়ে দেয়ার এবং পর্যায়ক্রমে সব মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করারও সুপারিশ করেন। শাসনতন্ত্রের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চৌধুরী কমিটি নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করার জন্য সুপারিশ করেন। এ ছাড়াও এ কমিটি জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার জন্য বলেন এবং সব উন্নয়নমূলক কাজ জেলা পরিষদের মাধ্যমে (যেখানে নির্বাচিত সদস্যরা থাকবেন) করার জন্য বলা হয়। থানা প্রশাসন সম্পর্কে চৌধুরী কমিটি মন্তব্য করেন যে, 'বাংলাদেশে প্রশাসনের মূল কেন্দ্র বিন্দু হওয়া উচিত থানা '। জেলা পরিষদের মত এখানে নির্বাচিত সদস্যগণের দায়িত্ব নেয়া উচিৎ এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি জাতীয় সরকারের কাছে না রেখে থানা পারিষদের কাছে হস্তান্তর করা উচিৎ। যে বিষয়গুলো হস্তান্তর করা যায় সেগুলো হলো ঃ কৃষি, পল্লী উন্নয়ণ কৌশল, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা, শিল্প (কুটির), সমবায়, মৎস্য, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ও পরিবার পরিকল্পনা।

বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও উপজেলা পদ্ধতি

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এদেশে বৃটিশ আমল হতেই বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালানো হয়, যদিও অনেক সময় দেখা যায় এর পেছনে রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণ কাজ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মূল সুপারিশ পাওয়া যায় চৌধুরী কমিটির রিপোর্টে। সেখানে নির্বাচিত পরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে 'বাংলাদেশে প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ থানা' এবং কি কি বিষয়ের উপর থানা পরিষদের কর্তৃত্ব থাকবে তাও সুপারিশমালায় বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক অসামঞ্জস্যতা

এডমিরাল খান কমিটি তাঁদেরকে দেয় শর্ত মোতাবেক ব্যাপক বিষয়াদির পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এ সময় তাঁরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কমিটি যে অসামঞ্জস্যতা দেখেন তা নিম্নরূপ ঃ

ক) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ;
খ) তদবীরের উপর ভিত্তি করে প্রায়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ;
গ) সরকারী কাজের বিভাজন ও সরকারী সিদ্ধান্তের জটিলতা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে উঠা কষ্টসাধ্য ব্যাপার

ঘ) সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জনকল্যাণমুখী নীতি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভাব ;
ঙ) সঠিক রাজনৈতিক নির্দেশনার অভাবে দূর্বল স্থানীয় সরকার আরো দূর্বলতর হয়েছে ;
চ) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচলিত প্রশাসনিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দূর্বল করা হয়েছে ;
ছ) সমসাময়িক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করা হয়েছে;
জ) স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বন্টনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনীহা।

কমিটির সুপারিশমালা

বিভিন্ন বিষয়াদি পর্যালোচনার পর কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো ঃ

ক) ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত পরিষদ থাকবে ;
খ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ থানা পরিষদের সদস্য থাকবেন এবং একই ভাবে থানা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকবেন।
গ) উল্লিখিত পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের পরিষদের সভায় যোগদান করবেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ;
ঘ) প্রত্যেক পরিষদকে কর্মকর্তা দ্বারা সমর্থন দিতে হবে ;
ঙ) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে তার কাজের জন্য দায়ী থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে ;
চ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়ামক বিষয়াদিও যাতে স্থানীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রনে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে ;
ছ) গ্রাম্য আদালতের ফলপ্রসূতা আরো জোরদার করতে হবে ;
জ) সব মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর ও সব বিভাগের অবলুপ্তি করতে হবে ;
ঝ) থানা পর্যায়ের সব কমিটি বাদ দিয়ে যখন প্রয়োজন তখন ভিত্তিতে কমিটি গঠন করা যেতে পারে ;
ঞ) জেলা ও থানা পরিষদগুলো পুলিশসহ নিয়ামক বিষয়াদি যাতে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে ;
ট) জেলা থানায় সুবিধাদি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মহকুমা সদরে ম্যাজিষ্ট্রেসি চালানো যেতে পারে। এ ছাড়াও কমিটি মনে করে যে প্রশাসনের মূল কেন্দ্র হওয়া উচিৎ থানা। কমিটি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে যে ক্ষমতা অর্পনকে অর্থবহ করতে হলে অবশ্যই নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গণঅংশায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়াও কমিটির মতে যেটা প্রয়োজন হবে তা হলো সত্যিকারভাবে গ্রামের মানুষকে সেবা করবে এ ধরনের মনোভাবাপন্ন কর্মচারী।

লক্ষ্যনীয় যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে চৌধুরী কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এডমিরাল খান কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির তেমন একটা পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় কমিটিই প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু

থানাই হওয়া উচিৎ বলে চিহ্নিত করে। এডমিরাল খান কমিটির মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার মধ্যে বেশী জোর দেয়া হয়েছে ঃ

(১) ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়ায় যতবেশী সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বসমূহ স্থানীয় সংস্থাসমূহকে কার্যকরভাবে পালন করার সুযোগ দিতে হবে। এবং

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বিষয়াদির বেলায় নিম্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের আরো বেশী ক্ষমতা দিতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের উপর সরকার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আগে মাঠ পর্যায়ে ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল যেমন ৪টি বিভাগ ২২টি জেলা, ৭১ টি মহকুমা এবং ৪৯৫টি থানা। এ ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল। নিম্নে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর এবং পাশাপাশি উক্ত পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার রূপ দেখানো হলো ঃ

চিত্র ৫·১

১৯৮২ সনের পূর্বে প্রশাসনিক স্তর

রাজধানী	সচিবালয় বিভাগীয় সদর দপ্তরসমূহ
বিভাগ	বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসমূহ
জেলা	জেলা প্রশাসক জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ জেলা পরিষদ
মহকুমা	মহকুমা প্রশাসক মহকুমা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ
থানা	সহকারী কমিশনার থানা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ থানা পরিষদ
ইউনিয়ন	ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র ঃ Report of the Committee for Adiministrative Reorganisation & Reforms পৃঃ ৫৬

LIBRARY

প্রশাসনের স্তর কমানোর লক্ষ্যে সরকার মহকুমাকে বাদ দিয়ে প্রায় সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু কিছু মহকুমাকে পার্শ্ববর্তী জেলার সঙ্গে এবং কিছু থানাকে পার্শ্ববর্তী থানার সঙ্গে একীভূত করা হয়। এভাবে ৬৪টি মহকুমাকে জেলা এবং ৪৬০টি থানাকে উপজেলা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় এভাবে সৃষ্টি হলো উপজেলা যাকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরা হয়।

জেলা পরিষদ

উপজেলা প্রশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নব সৃষ্ট জেলা পরিষদ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সনের পর যদিও জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে জেলা পরিষদের কাজ চালানো হচ্ছিল, ১৯৮২ সনে পট পরিবর্তনের পর জেলা পরিষদের অস্তিত্ব নামে মাত্রই ছিল। এ সময় এর কোন ভূমিকা ছিল না। এডমিরাল খান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার জেলা পরিষদ গঠনকল্পে ১৯৮৬ সনে ৩য় সংসদে একটি বিল আনয়ন করেন, কিন্তু বিরোধী দলের আপত্তির জন্য তা কার্যকর করা হয়নি। তবে ৪র্থ সংসদে জেলা পরিষদ বিল পাশ করা হয় যা ১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন হিসেবে পরিচিত। উক্ত আইনের ৪ নং ধারা মোতাবেক জেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় ৪ ধরনের সদস্যের কথা বলা হয়েছে যেমন ঃ (ক) প্রতিনিধি সদস্য, (খ) মনোনীত সদস্য, (গ) মহিলা সদস্য এবং (ঘ) কর্মকর্তা সদস্য। সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করার বিধান রাখা হয়েছে! ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১২ই অক্টোবর ১৯৮৮ হতে তাঁরা দায়িত্ব পালন আরম্ভ করেন। এর ফলে জেলা পর্যায়ে ক্ষমতা বন্টনের আর একটা দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের উপর বেশী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পন করা হয়েছে তা নয় বরং উপজেলা পর্যায়ে ঃ

(১) আরো অফিস সৃষ্টি করা হয়েছে;
(২) কর্মকর্তাদের মর্যাদা উন্নত করা হয়েছে;
(৩) উপজেলা পর্যায়ে ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হয়েছে; এবং
(৪) উপজেলায় সরাসরিভাবে অধিক তহবিল দেয়া হচ্ছে।

১৯৮২ সনের ২৩ শে অক্টোবর সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা হচ্ছে থানা গুলোকে উন্নীত করে উপজেলা সৃষ্টি করা। এ সিদ্ধান্তই হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ধারনা ও কার্যকরিতার আসল ভিত্তি। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের আইনগত কাঠামোর নির্দেশনা দেয়।

সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

১৯৮২ সনের ২৩ শে অক্টোবর উপজেলা পর্যায়ে সরকারের কার্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, একটি সংরক্ষিত ও অপরটি হস্তান্তরিত তালিকা। ১৩টি বিষয়কে সংরক্ষিত ও ১০টিকে

হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়। কি কি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং কি কি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে তার একটা তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সংরক্ষিত বিষয়াদি	হস্তান্তরিত বিষয়াদি
১। আইন, শৃঙ্খলা সংরক্ষন ;	১। কৃষি ও কৃষি সম্প্রসারণ, বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহ ও সেচ ;
২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ;	২। প্রাথমিক শিক্ষা ;
৩। আয়কর, আবগারী শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদির ন্যায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ;	৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দাতব্য চিকিৎসা ও জন্ম নিয়ন্ত্রনের সব কার্যাদি ;
৪। প্রয়োজনীয় সরবরাহের সংরক্ষণ ;	৪। পল্লী পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচী ;
৫। বৃহদাকারের শিল্প কারখানা ;	৫। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী
৬। একাধিক জেলার সঙ্গে সংযুক্ত বৃহদাকারের সেচ প্রকল্প ;	৬। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ;
৭। খনি ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন ;	৭। ভি জি এফ এবং আই জি এফ সহ ত্রান কার্যাদি ;
৮। বিদ্যুৎ সরবরাহ ;	৮। সমবায় ও সমবায় ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ;
৯। কারিগরি শিক্ষা ও প্রাথমিক পর্যায়ের উপরের সব শিক্ষা ;	৯। মৎস্য উন্নয়ন ;
১০। আধুনিক জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সহিত সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ ;	১০। পশুসম্পদ উন্নয়ন ;
১১। আন্তঃ জেলা ও আন্তঃ উপজেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা ;	
১২। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও পানি সম্পদের উন্নয়ন ;	
১৩। জাতীয় পরিসংখ্যান ;	

উপরোক্ত তালিকা হতে দেখা যায় স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্যাদি উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বৃহদাকারের জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজ ও নিয়ন্ত্রনমূলক কার্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখে দেয়া হয়। এ উপজেলা প্রশাসনের কাঠামো চিত্র ৫·২ –তে প্রদর্শিত হলো।

চিত্র ৫.২

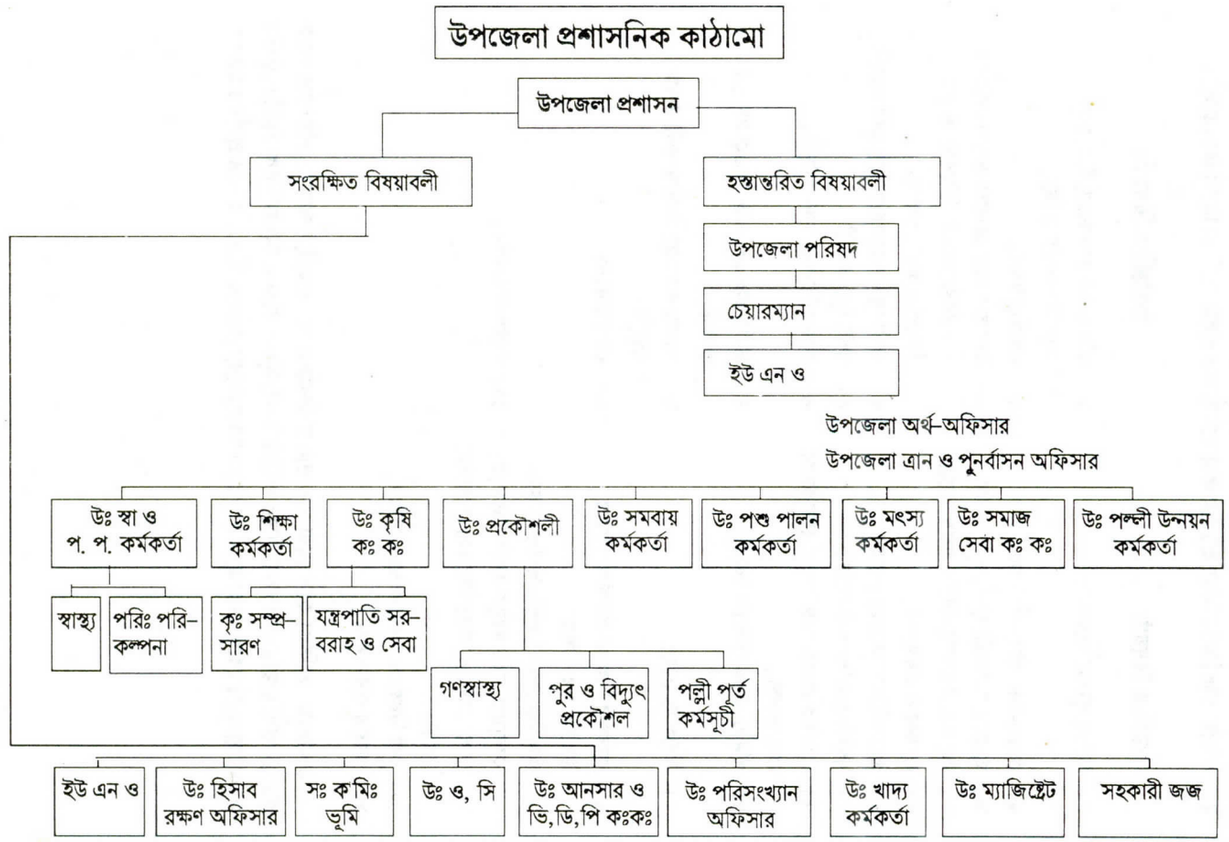

সূত্র ঃ ফয়েজ উল্লাহ ঃ Development of Local Govt. in Bangladesh

বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থার কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আদালত সৃষ্টি

সরকার প্রায় সকল স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যাদি উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করার সাথে সাথে উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের কাজের সুবিধার জন্য উন্নয়নের স্বার্থে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন যাতে তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সব বিষয়ে নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের জন্য অযথা নির্ভর করতে না হয়। এজন্য কিছু নতুন অফিসও খোলা হয়, যেমন (১) উপজেলা ট্রেজারী (২) উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস (৩) পি এল হিসাবের প্রবর্তন। পি এল হিসাব খোলার ফলে উপজেলা পরিষদকে জেলা অফিস বা কারো জন্য তহবিলের ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করা হয় এবং সহকারী জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। এর ফলে জনগণের দোরগোড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ে আসা হয়। পল্লীর সাধারণ মানুষকে এখন সাধারণ মামলার জন্য দূরদূরান্তে যেতে হয় না।

প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা ও তহবিল সংকুলান

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অপেক্ষা বা নির্ভর করতে হয় না। এখন উপজেলা পরিষদ নিজেই প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়ন করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ, জনসম্পদ ও অন্যান্য সমর্থনসূচক বিষয়াদির প্রয়োজন হচ্ছে। এ অসুবিধাদি দূরীকরণের জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে উল্লেখযোগ্য তহবিল দিয়ে থাকেন। এছাড়া পরিষদ যাতে নিজেদের তহবিল সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য বিধান রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও পূর্বের চেয়ে এখন বেশী পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা। সরকার হতে প্রাপ্ত তহবিল দিয়ে পরিষদ উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদন করেন এবং নিজেদের সৃষ্ট তহবিল দিয়ে দৈনন্দিন খরচাদি সংকুলান করেন।

দক্ষ অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য সব সূত্র হতে প্রাপ্ত তহবিলকে একীভূত করে পরিষদ তহবিল গঠন করা হয় এবং পরিষদ বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে এ তহবিল ব্যবহার করতে পারে। পরিষদের বাজেট দু'ভাগে ভাগ করা হয়– একটি রাজস্ব বাজেট এবং অপরটি উন্নয়ন বাজেট। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন বাজেটের টাকা খরচ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা আছে যা স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

LIBRARY

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রতিবৎসর জাতীয় বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল হতে দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১৯৮২–৮৩	টাকা	১৩০০	মিলিয়ন
১৯৮৩–৮৪	,,	১৭০৯·৫	,,
১৯৮৪–৮৫	,,	২০০০	,,
১৯৮৫–৮৬	,,	২০০০	,,
১৯৮৬–৮৭	,,	১৬০০	,,
১৯৮৭–৮৮	,,	২০০০	,,
১৯৮৮–৮৯	,,	১৭০০	,,
	মোট	১২৩০৯·৫	,,

এছাড়া সরকার প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে উপজেলার অফিস ও আবাসিক সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য এক সাথে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। উন্নয়নমূলক কার্যাদি তদারক করার জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে একটি গাড়ী/নৌযান দেয়া হয়।

বহু উপজেলা আছে যেখানে আবাসিক সুবিধাদি খুবই কম বা নেই বললেই চলে। উপজেলায় ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য সরকার উন্নয়ন সহায়ক তহবিলের পাশপাশি কাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন তহবিল উপজেলা পরিষদের কাছে দিয়ে থাকেন এখাতে ১৯৮২–৮৩ হতে ১৯৮৬–৮৭ পর্যন্ত নিম্নলিখিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হয় ঃ

১৯৮২–৮৩	টাকা	১৪০০	মিলিয়ন
১৯৮৩–৮৪	,,	১৭২৩	,,
১৯৮৪–৮৫	,,	২২৩০	,,
১৯৮৫–৮৬	,,	২২৫০	,,
১৯৮৬–৮৭	,,	১৭৫০	,,
	মোট	৯৩৫৩	,,

উল্লেখ্য, এ খাত হতে ১৯৮৪–৮৫, ১৯৮৫–৮৬ এবং ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছরে নব সৃষ্ট জেলা সদরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কিছু টাকা ব্যবহার করা হয়।

উপজেলা পরিষদের কর্মী কাঠামো

স্থানীয় সরকারী সংস্থা হিসেবে এর প্রতি যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ আকৃষ্ট হবে না–এটা বিবেচনা করে সরকার তার নিজস্ব কর্মকর্তাগণকে পরিষদের কাছে ন্যস্ত করেন। ১৯৮২ সনের ২০শে অক্টোবরের কার্যক্রম অনুযায়ী সকল হস্তান্তরিত বিষয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিষদের নিকট

ন্যস্ত হয় এবং মূলতঃ ১৯৮৫ সনের ১লা জুনের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীর ধরনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর একটা প্রকৌশল বিভাগ। প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হচ্ছে একজন সহকারী প্রকৌশলী বা অন্ততঃ পক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী। উপজেলা পর্যায়ের সকল কারিগরি কর্মকর্তা এ বিভাগের আওতায় থাকবেন, যদিও বিশেষ ধরনের কর্মসূচীর বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিজস্ব পরিচয়ও বজায় রাখতে পারবেন—যেমন পল্লী পানি সরবরাহ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ইত্যাদি।

উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন চেয়ারম্যান, যাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ইউ এন ও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ইউ এন ও তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে চেয়ারম্যানকে সাহায্য করেন। সাথে সাথে ইউ এন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোর মধ্যেও সমন্বয় সাধন করে থাকেন। আবার কিছু দপ্তর আছে যা সরাসরি ইউ এন ও এর নিয়ন্ত্রণে, যেমন ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা।

উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার জন্য উপজেলা পরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার বিভাগ ব্যতীত অন্য সকল সংরক্ষিত বিষয়ের কর্মকর্তাগণকে উপজেলা পরিষদের নিকট 'জবাবদিহি' করতে হয় অর্থাৎ তাদের কোন কার্যক্রমের উপর উপজেলা পরিষদ প্রতিবেদন চাইলে তারা তা দিতে বাধ্য থাকেন। অপর দিকে হস্তান্তরিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সকল কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের কাছে শুধু জবাবদিহিই করতে হয় না সংগে সংগে হিসাব নিকাশের জন্যও দায়ী থাকেন। সুতরাং এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের গঠন প্রকৃতি

নির্বাচিত, প্রতিনিধিত্বমূলক, মনোনীত এবং কারিগরি ও পেশাগত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। পরিষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। প্রতিনিধি সদস্যরা হচ্ছে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সদস্য ; সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বসবাসরত মহিলাদের মধ্য হতে তিনজন মহিলা সদস্য ও পুরুষদের মধ্য হতে একজন পুরুষ সদস্য যাদেরকে সরকার মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন এমন সব উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ পরিষদের সদস্য হয়ে থাকেন। কর্মকর্তা সদস্যগণ পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের অবলুপ্তিসাধন

ইতোপূর্বে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো সাধরণতঃ আমলাগণ কর্তৃক বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো ; ফলে অনেক সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেতো। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর বিকাশ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre

সাধনে এটা একটা বাঁধা স্বরূপ ছিল। উপজেলা পদ্ধতিতে এর অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে উপজেলা পরিষদের নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ বা 'নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে কিছু নেই। একটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে পরিষদ তার সব কর্মকাণ্ড নিজেই নিয়ন্ত্রন করে। পরিষদ আমলা নির্ভর নয় এমনকি সরকারী সহায়তা তহবিলের ক্ষেত্রেও আমলাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে তার সম্পর্ক কার্যাদির বিষয়ে খবরাখবর নেয়া, মূল্যায়ন, পরিদর্শন, কারিগরি উপদেশ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে যাতে উপজেলা পরিষদগুলো তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং প্রকল্প তৈরীর সময় খাতওয়ারী বরাদ্দ সঠিকভাবে পালন করেন তার জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিষদকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ উপদেশমালার বিশেষ দিক হচ্ছে ঃ

(ক) উপজেলা পরিষদগুলো যাতে জাতীয় অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে উন্নয়ন সহায়ক তহবিল দ্বারা উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে ;

(খ) উপজেলা পরিষদ যাতে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ;

(গ) উপজেলা পরিষদ যাতে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করে ও প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ না দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ কম দেখায় ;

(ঘ) যাতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় জনসংখ্যা, এলাকা, অনগ্রসরতা, পূর্ববর্তী সময়ে সফলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি দেখে প্রকল্প নেয়া হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা ;

(ঙ) স্থানীয়ভাবে তহবিল গঠন করে তা রক্ষনাবেক্ষণ কাজে খরচ করার জন্য উপদেশ প্রদান ইত্যাদি।

উপজেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব ঃ একটি বিশ্লেষণ

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক কার্যক্রম/প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, প্রাথমিক শিক্ষা, নিবিড় চাষাবাদ ও সেচ ; সমাজ সেবা, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।

যেহেতু প্রশাসন প্রকল্পগুলোর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে তাই প্রকল্পের গুণাগুন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা যায় এমনকি বাস্তবায়নের সময়ও দোষত্রুটি দূর করা যায়। অধিকন্তু এতে জনগণের আগ্রহ দেখা যায় ও প্রকল্পে গণ অংশায়ন সম্ভবপর হয়ে থাকে। বহু প্রকল্প আছে যেগুলোর সফল বাস্তবায়ন, স্থায়ীত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ অনেকাংশে বাস্তবায়ন পর্যায়ে গণ অংশায়নের উপর নির্ভর করে।

এছাড়া, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপকতার ফলে গ্রাম হতে শহরের দিকে ধাবমান লোকের সংখ্যা অনেকাংশে কমেছে। ইতিপূর্বে সকল উন্নয়ন কর্মসূচীই শহর কেন্দ্রিক ছিল, ফলে কর্মজীবি জনগণ শহরের দিকে ধাবিত হতো কিন্তু এখন উপজেলা পর্যায়ে

ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতা চলছে এবং কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে বলে শহরের প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে শহর ভিত্তিক অনেক কর্মকর্তাও কার্যোপলক্ষ্যে উপজেলায় যাচ্ছেন। এর ফলে শহরগুলো হতে চাপ অনেকাংশে কমেছে।

যেহেতু বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বর্তমানে বহু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয় তাই জাতীয় সরকারের এদিকে অযথা সময় ব্যয় করতে হয় না। জাতীয় সরকার এখন অধিক গুরুত্ব সহকারে জাতীয় সমস্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিকেন্দ্রীকরণের নামে চালু করেন মৌলিক গণতন্ত্র এবং এ প্রক্রিয়ায় চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ছিল— যেমন ঃ ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল। এখানে আমরা একটা স্তর থানা কাউন্সিল বা থানা পরিষদ পাই (বর্তমানে থানাকে উপজেলা বলা হয়)। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যদিও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এ কাউন্সিলগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। তৎকালীন সরকারের কর্মসূচীর পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ডায়না কনিয়ার্স যথার্থই বলেছেন বিকেন্দ্রীকরণের দু'ধরনের লক্ষ্য থাকে, একটা প্রকাশ্যে বলা হয়ে থাকে এবং অপরটা প্রচ্ছন্নভাবে যা মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাধীনতা লাভের সময় হতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পট পরিবর্তনের সময়কে ১ম ভাগ ; পট পরিবর্তনের পর হতে ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ২য় ভাগ এবং ২৪শে মার্চ হতে এখন পর্যন্ত সময়কে ৩য় ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগের সময়টি ছিল মূলতঃ যুদ্ধোত্তর দেশে পুনর্বাসনের সময়। কোন্ ধারায় রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তা-ই তখন একটা মূল প্রশ্ন ছিল। আমাদের দেশে প্রথমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার তারপর সংসদীয় গণতন্ত্র আবার রাষ্ট্রপতি শাসিত এক দলীয় সরকার ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা পরীক্ষিত হবার আগেই অবলুপ্ত হয়। ১৯৭৬ হতে ১৯৮২ পর্যন্ত সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তবে পাকিস্তান আমলের ধাচে জেলা কাউন্সিল ও থানা কাউন্সিল পুনঃ করা হয় যার নেতৃত্বে সরকারী আমলা অর্থাৎ জেলা প্রশাসক এবং মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। ঐ সময় (১৯৭৬-৮২) সমূহের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে স্থাপন করা হতো তা চিত্র ৬.১ এ দেখান হলো। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাধারণ মানুষের জন্য এটা একটা সহজ পদ্ধতি ছিল না। এ পদ্ধতিকে কিভাবে আরো সহজ করা যায় অর্থাৎ প্রশাসনকে কিভাবে জনগণের কাছাকাছি নেয়া যায় ৩য় ভাগে অর্থাৎ ১৯৮২ সনে ২৪শে মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের পর ডায়না কনিয়ার্সের ভাষায় অন্ততঃ প্রকাশ্য উপায়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। প্রথমতঃ ধরে নেয়া হয়েছিল যে বেসামরিক প্রশাসন-এ অপর্যাপ্ততার আলোকে সরকার মনে করলেন যে ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার আলোকে প্রশাসনকে এমনভাবে সাজাতে হবে যার ফলে প্রশাসন জনগণের খুব কাছাকাছি চলে যায়। দ্বিতীয় কারণের মধ্যে দেখা যায় যে সরকারের একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল প্রশাসন জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

চিত্র ৬.১

সরকার,মাঠ পর্যায়ের দপ্তর ও স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সম্পর্ক ১৯৭৬-৮২

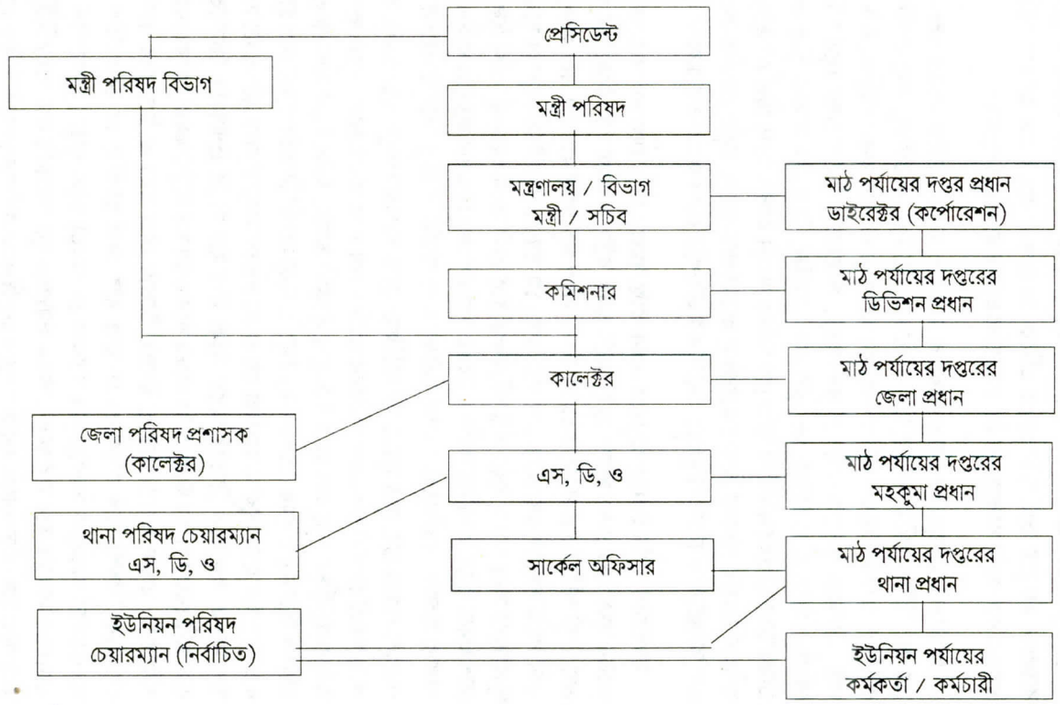

সূত্র ঃ প্রশাসনিক পুনর্গঠন/সংস্কার কমিটির রিপোর্ট – ১৯৮২

এ উদ্যোগের প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য জানতে যদিও আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণার অপেক্ষা রাখে তবুও দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে–প্রথমতঃ প্রশাসন অনেকটা উপর নীচ (টপ–ডাইন) প্রকৃতির ছিল, এটিকে নীচ উপর (বটম–আপ) করার প্রয়োজন অনুভব করা হয় এবং দ্বিতীয়ত ঃ প্রকাশ্য লক্ষ্য ছিল বেসামরিক প্রশাসনকে ক্ষমতা বন্টনের আলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। প্রায়ই যুক্তি দেখান হয় যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং এর সফল বাস্তবায়নে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটা প্রতিফলন ঘটে। তাহলে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা কি তা জানা দরকার। দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি আশা করে যে মৌলিক আইন ; শাসনতন্ত্র ইত্যাদি বলবৎ আছে এবং এর ফলে সংসদ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ স্বাভাবিক ভাবে তাদের কাজ করছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে এ অবস্থায় ধরে নেয়া হয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলগুলোও স্বাধীনভাবে মত বিনিময় ও চিন্তা করছে। যদি রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এই হয় তা হলে বলা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো তৈরী করা হয় নি। এর ফলে বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা গেছে মত পার্থক্য। এখানে ডায়না কনিয়ার্সের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কোন প্রকার বিকেন্দ্রীকরণমুখী সংস্কার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে জটিল, কারণ এর সংগে অনেকগুলো বিষয়, প্রশ্ন ও স্বার্থ জড়িত এবং গোটা প্রক্রিয়াই প্রকৃতভাবে রাজনৈতিক। যার ফলে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সোজাসুজি ও যুক্তিযুক্তভাবে করা যায় না।

১৯৮২ সনে প্রশাসনিক পুনর্গঠন / সংস্কার এর জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু করা হয় তার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে,

(ক) শতাব্দীরও বেশী পুরাতন মহকুমার অবলুপ্তি সাধান ;
(খ) নিয়ামক (regulatory) ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী দেখার সুবিধার্থে থানা উন্নীতকরণ ;
(গ) সমপর্যায়ের কোন স্থানীয় সরকার সংস্থা সৃষ্টি না করে মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করা (ইতোমধ্যে অবশ্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয় এবং চেয়ারম্যানও নিযুক্ত করা
(ঘ) স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে পুরাতন থানা কাউন্সিল গুলোকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তর ;
(ঙ) থানা কাউন্সিলের কাঠামো অপরিবর্তনীয় রেখে এটিকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত করা, এবং
(চ) উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে আনা (পরিবর্তিত প্রশাসনিক কাঠামো চিত্র ৬.২-এ দেখান হলো)। যদিও প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে জনগণের সুবিধার জন্য প্রশাসনিক স্তর কমানো হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় একমাত্র মহকুমা স্তর ছাড়া কিছুই কমেনি। অন্যদিকে উপজেলা পরিষদ কেবলমাত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণেই নয় বরং তাদেরকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের আদেশ নির্দেশও পালন করতে হয়।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

চিত্র - ৬.২

কেন্দ্রের সাথে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতি

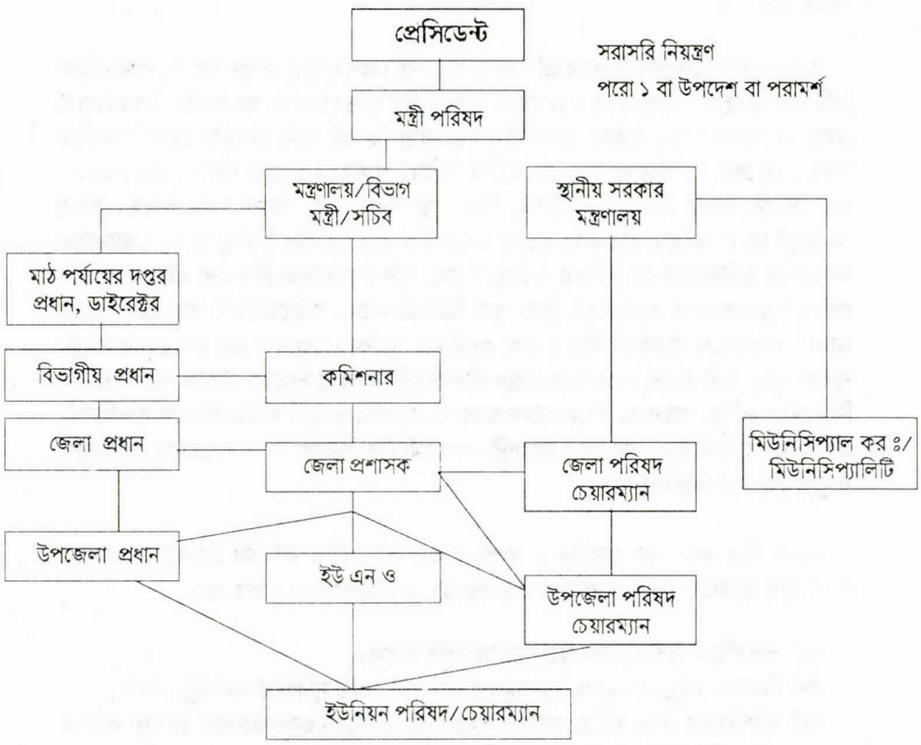

বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে বিচারের সুবিধার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিচার বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসনকে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়ন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আবার দ্বিমুখী। উপজেলা পদ্ধতি অপছন্দ করে এমন সব রাজনৈতিক দলের বিরোধীতা এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের সদস্য অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। উপজেলা পদ্ধতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে কেন্দ্র ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে

রাজনৈতিক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে বলে বিরোধী দলগুলোর ধারণা। তাদের মতে এটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে না হয়ে শাসনতান্ত্রিকভাবে আসা উচিৎ ছিল। তারা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনে বিরোধিতা করে। অন্য দিকে দেখা যায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যেমন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন পরিষদের প্রতিনিধি সদস্যগণও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সদস্যগণ নিয়ম মোতাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারেন। প্রতিনিধি সদস্যদের পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রায় ক্ষোভ প্রদর্শন করার প্রবণতা দেখা যায়। এর বড় একটি কারণ হচ্ছে উপজেলা তহবিলের উপর চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক এ ক্ষমতা অপব্যবহারের বহু উদাহরণ আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে উপজেলা পদ্ধতিতে নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। যার ফলে যদিও পরিষদ চেয়ারম্যানকে অপসারণ করার বিধান রাখা আছে কিন্তু এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খুবই জটিল বিধায় পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। অনেক সময় তারা পরিষদের সভায় উপস্থিত হন না, যার জন্য উন্নয়ন কাজসহ বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধান করা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের কারণ মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। উপজেলা পদ্ধতি সৃষ্টির পূর্বে সব সময় একজন সরকারী কর্মকর্তা (সার্কেল অফিসার/ সহকারী কমিশনার) কার্যতঃ থানা কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকতেন। এমনকি এ পদ্ধতি আরম্ভ হওয়ার দু'বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত একজন সরকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ ইউ এন ও পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন এবং চেয়ারম্যানের সব সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করেন কিন্তু চেয়ারম্যানের নির্বাচনের পর তিনি তাঁর অবস্থান হতে সরে আসেন। এমনও দেখা গেছে একজন প্রতিনিধি সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এমন অবস্থায় পরিস্থিতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। অবশ্য সরকার এ ধরনের পরিস্থিতি অতি দ্রুত নিরসন করেন ইউ এন ও বদলী করার মাধ্যমে। অন্যদিকে চেয়ারম্যানের পক্ষ হতেও অসুবিধা দেখা দেয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অন্য যে কোন প্রতিনিধি হতে ভিন্নতর, কারণ তিনি শুধু তাঁর এলাকার প্রতিনিধিত্বই করেন না বরং তাঁকে নির্বাহী কাজও করতে হয় যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর দক্ষতা ও সরকারী কাজের অভিজ্ঞতা। চেয়ারম্যানগণের এ ধরণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে বহু জটিলতা দেখা দেয়। অদক্ষ চেয়ারম্যানের অধীনে কাজ করতে অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণও কিছু অনীহা প্রকাশ করেন।

ক্ষমতা বন্টন/অর্পণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি আনা ও আমলা গোষ্ঠীকে স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি করাই ছিল অন্যান্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। সেই প্রচ্ছন্ন লক্ষ্যকে প্রকাশ্য রূপ দেয়ার জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পুলিশ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এব্যবস্থার ফলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানগণ ও চেয়ারম্যানের মধ্যে প্রচণ্ড মত বিরোধের সৃষ্টি করে। আংশিকভাবে এ বিরোধ সরকার মীমাংসা করেন এভাবে যে, বিভাগীয় প্রধানগণ স্ব স্ব বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর পেশা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ রাখবেন।

এর ফলে অবশ্য আর একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পক্ষে দুই কর্তৃপক্ষকে একসংগে খুশী রাখা অসুবিধা হয়ে পড়ে। এমনও দেখা গেছে বিভাগীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজে বা কোন সভায় উপজেলা কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আবার একই দিন উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে চেয়ারম্যানের সংগে অথবা বিভাগীয় কর্মকর্তা উপজেলায় বিভাগীয় কাজ কর্ম পরিদর্শনে গেলেন অথচ উপজেলা কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের নির্দেশে জরুরী কোন দায়িত্ব পালনের জন্য কোন মফঃস্বল এলাকায় চলে গেলেন। এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি ও অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এর ফলে লক্ষ্য করা গেছে বিভাগীয় প্রধানগণ তাদের স্ব স্ব কাজ কর্ম তদারক করার জন্য কোন উপজেলায় আগের মত পরিদর্শনে যান না বা মোটেই উৎসাহ দেখান না।

প্রশাসনিক বিরোধের আর একটি ক্ষেত্র দেখা দেয় যাকে কেসলার বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ প্রশাসক এর মত বিরোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ আসার পূর্বে ইউ এন ও (যিনি সাধারণ প্রশাসনের দলে পড়ে) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি যতটুকু সম্মান আশা করতেন অনেক সময় বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের কাছ থেকে তা পাওয়া যেত না। এমনকি এ মানসিকতা নির্বাচিত চেয়ারম্যান আসার পরও চলতে থাকে। কারণ চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ অনেকের পছন্দ হয়নি।

বাস্তবায়নের দ্বন্দ্ব বিরোধের আর একটি কারণ হিসেবে এধরনের বিরোধকে কেসলারের মতে কার্যক্ষেত্র বিরোধ বলা যায়। পুরোনো মহকুমাগুলো হতে নতুন জেলার সৃষ্টি এবং পুরোনো থানাগুলোকে উপজেলায় পরিবর্তনই কার্যক্ষেত্রে বিরোধের মূল সূত্রপাত। কতগুলো সরকারী দপ্তর যেমন– সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ এবং কিছু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যেমন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রভৃতির কার্যক্ষেত্রের সঙ্গে নব সৃষ্ট জেলা ও উপজেলাগুলোর সীমানার সংগে সামঞ্জস্য না থাকার ফলে এ সব দপ্তর বা বিভাগের সঙ্গে জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়।

অনেকেই মনে করেন বিকেন্দ্রীকৃত বিচার ব্যবস্থা দু'কারণে সন্তোষজনক ভাবে চলছে না। প্রথমতঃ খুব দ্রুত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, এমনকি তাদেরকে ন্যূনতম বা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই সরাসরি কাজ করতে দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কোন উপজেলাতেই উন্নতমানের কৌশুলী নেই বা আইন বিষয়ে জানার মত কোন গ্রন্থাগার নেই। এমন উপজেলা দেখা গেছে যেখানে একজন উকিলও ছিল না–সংগত কারণে মামলার উভয় পক্ষকেই জেলা সদরে গিয়ে কৌশুলী আনতে হতো। আরো দেখা গেছে জেলা সদরের জজ কোর্ট বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কোর্টের মামলা বাদ দিয়ে উন্নতমানের কৌশুলী কোন উপজেলায় যেতে চান না। এধরনের পরিস্থিতিতে যদি পক্ষগণ বিত্তহীন হন তাহলে কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে তা অনুমান করা যায়। মান যত নিম্নমানেরই হোক না কেন যেহেতু জেলা সদর হতে যাচ্ছেন তাই অনেক সময় আর্থিক কারণের সংগে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্যও কৌশুলীগণ অধিক হারে ফি দাবী করেন। ইতোমধ্যে অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও যে উল্লেখযোগ্য তা নয়। দ্বিতীয়তঃ যদিও বলা হয়ে থাকে ম্যাজিস্ট্রেসীকে চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। ইউ এন ও'র

অবর্তমানে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইউ এন ও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইউ এন ও চেয়ারম্যানের ষ্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন। স্বাভাবিকভাবেই পরোক্ষভাবে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর চেয়ারম্যানের প্রভাব পড়ে। উপজেলা অর্থ অফিসার যিনি একজন সহকারী কমিশনার। খণ্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেন। সহকারী কমিশনার সরাসরি চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে থাকেন এবং চেয়ারম্যান তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনও লিখে থাকেন। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে চেয়ারম্যান বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। আবার এমনও দেখা গেছে চেয়ারম্যান তার দলবল নিয়ে মিছিল করে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আক্রামণ করে তার বা তার দলীয় লোকের পক্ষে রায় দাবী করেছে।

ফৌজদারী আদালতে সরকারী পক্ষের মামলা পরিচালনা করার জন্য পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে পুলিশ কর্মকর্তা তার বিভাগীয় কাজ কর্মে খুব ভাল করে না তাদেরকেই কোর্টে অনেকটা শাস্তিস্বরূপ নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ এই পুলিশ কর্মকর্তাকে কোর্টে সম্পূর্ণভাবে একজন বিজ্ঞ কৌশুলীর ভূমিকা পালন করতে হয়। অনভিজ্ঞ কৌশুলী, পুলিশ কর্মকর্তা, অনভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণহীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগতভাবে উন্নতমানের বিচার আশা করা যায় না। আদালত দোরগোড়ায় হওয়ায় অনেক সময় দেখা যায় খুব ছোট বিষয়কে বড় করে দেখিয়ে মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। যদিও দাবী করা হয় আদালতের সংখ্যা বেশী হওয়াতে মামলা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় নিষ্পত্তির হারের চেয়ে নতুন দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা বেশী। বড় বড় শহরের কৌশুলীগণ বিচারে প্রহসনের দোহাই দিয়ে প্রথম থেকে বিকেন্দ্রীকৃত বিচার ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আসছেন। মূলতঃ তাঁদের ক্ষোভের বড় কারণ হচ্ছে শহর হতে এখন মামলা নব সৃষ্ট জেলায় বা উপজেলায় চলে যাওয়ার ফলে তাঁদের স্বাভাবিক আয়ে টান পড়েছে। তবুও এ বিরোধিতা নতুন ব্যবস্থার জন্য নেতিবাচক বটে।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে উপজেলা পরিষদ প্রশাসনিক ক্ষমতা বন্টনের ফসল। কারণ পরিষদের হাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বিশেষ করে উন্নয়নমূলক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অন্ততঃ ১৯৮২ সনের ২৩শে অক্টোবরের কার্যক্রমে এটা বিধৃত আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ একটি কল্পনা মাত্র। যে দু'টি তালিকা তৈরী করা হয়েছে মূলতঃ তার মধ্যে সংরক্ষিত তালিকা অসম্পূর্ণ। যদিও বলা হয়েছে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ রাখা হয়নি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় উপজেলা পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তিন জন মহিলা সদস্য ও একজন পুরুষ সদস্যের মনোনয়ন দান, বাজেট অনুমোদন, উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, কর আরোপ করার প্রস্তাব অনুমোদন, পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন প্রস্তাব নাকোচ করা, পরিষদের জন্য যে কোন আইন তৈরী করা ইত্যাদি। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা নির্ভর করে সরকার একে কতটুকু ক্ষমতা দিচ্ছে তার উপর। উপজেলা পরিষদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে উপজেলা পরিষদকে সরকার উন্নয়ন সহায়ক তহবিল হিসেবে প্রতি বছর মঞ্জুরী দিয়ে থাকেন এবং এ মঞ্জুরী বিনা শর্তে দেয়া হয় না। কোন্ খাতে কত খরচ করতে হবে বা কি ধরনের প্রকল্প নেয়া যাবে ইত্যাদি নিয়ম-কানুন অবশ্যই পালন করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

উপজেলা সৃষ্টির মূল বক্তব্য ছিল প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিতে হবে এবং জনগণের মংগলের জন্যই সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত দেশের দারিদ্র্য দূর করা হবে। এ উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে তা দেখতে হবে। বাস্তব রূপ অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত। এর কারণ পরিকল্পিত উপায়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না, প্রায়ই সরকারী নির্দেশে যদিও বলা হয়েছে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকেই তা করতে হবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এ কাজটি সন্তোষজনকভাবে কোথাও করা হয়নি। কিভাবে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে তা সরকারী নির্দেশে বলা নেই, এমনকি এর জন্য কোন নমুনাও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে জেলা পর্যায়ে বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেখান না। কারণ আগের মত কোন প্রকল্প জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয় না। ফলে উপর-নীচ এবং নীচ-উপর এর মধ্যে মোটেই সমন্বয় সাধিত হচ্ছে না। সুতরাং উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অলৌকিক বস্তু হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব সংসদে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সংসদ সদস্যগণ কখনো শুধু আইন প্রণয়ন করেই সন্তোষ্ট হননি। সংসদের বাইরেও তাঁরা তাদের কাজের পরিধি ব্যপৃত করেছেন। অবশ্য এর জন্য আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাও দায়ী। প্রত্যেক সংসদ সদস্যেরই একটি নির্বাচনী এলাকা আছে যেখানকার নির্বাচকগণ স্বাভাবিকভাবেই এ এলাকার সংসদ সদস্যের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন এটা উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমেও হতে পারে বা ব্যক্তি পর্যায়েও হতে পারে। কিন্তু সংসদ সদস্যের আর্থিক কোন ক্ষমতা না থাকায় তিনি অনেক সময় উপজেলা পরিষদের উপর প্রভাব খাটাতে চান। এদিকে সংসদ সদস্যগণকে সরকার তাঁদের এলাকার বিভিন্ন কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলতঃ অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপদেশ শুনতে হয়। যদি সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যানের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয় তা হলে কোন কোন সময় মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তা উন্নয়নের পথ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

উপজেলা পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নেই। যদিও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে বিভাগীয় কাজ তদারক করার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু তা খুবই অস্পষ্ট। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ হতে গত ৩০শে জনু '৮৫ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং মপবি/জে প্র-২/১(২২)/৮৫-২৯৪ এ উপজেলা পরিষদের সঙ্গে সরকারী কর্মকর্তাগণের সম্পর্কে অনুঃ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ-এ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ পরিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। পরিদর্শন শব্দটির প্রায়োগিক দিক ততটা পরিস্কার নয়। এতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করবেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। যদিও আইনগত কোন সমর্থন নেই তবুও বলা হয়ে থাকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সরকারের উপ-সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন কোন জেলা প্রশাসক বা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা। তবে উপ-সচিব পদ মর্যাদার বেশী নহেন, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আরো কম পদমর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং তথাকথিত উপ-সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন চেয়ারম্যান এ ধরনের উপদেশ অনেক সময়ই শুনতে চান না বা তাতে তাঁর কাজে হস্তক্ষেপের সামিল বলেই মনে করেন।

সুপারিশ

১। যদিও প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করতে বলা হয়েছে এবং এর উপর নির্ভর করে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হয়ত কষ্টসাধ্য হতে পারে কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে অবশ্যই চলতে হবে। এ নিশ্চয়তা বিধানের জন্য দায়িত্ব পরিষদকে অবশ্যই বহন করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দের ও ছাড়পত্র দেয়ার ব্যাপারে এটি পূরণ একটি পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত।

২। প্রত্যেক উপজেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করার ফলে একদিকে যেমন দক্ষ কর্মকর্তা / কর্মচারী ও কৌশুলীর অভাব দেখা দিয়েছে অন্যদিকে জেলা সদর হতে বিচারাধীন হাজতী আসামীদের আনা নেয়ার অসুবিধা ছাড়াও প্রত্যেক উপজেলায় টাউট বাটপার ও মামলা বাজের সংখ্যা বেড়েছে। এর সঙ্গে সরকারী খরচও আছে। অনেক উপজেলায় মামলার সংখ্যা খুবই কম। এ সব দিক বিবেচনা করে ৩ থেকে ৪টি উপজেলার মধ্যে একটি আদালত সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

৩। বর্তমানে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আছে। পরিষদ ছাড়াও এ মন্ত্রণালয় আরো নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড দেখেন। এর ফলে গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। উপজেলা পরিষদের কাজ আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখাশুনার জন্য একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পরিদপ্তর খোলা যেতে পারে, যার দায়িত্ব একজন সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদ মর্যাদাসম্পন্ন মহাপরিচালক থাকবেন।

৪। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচন একই দিন হওয়া বাঞ্ছণীয়, এতে একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে যা কাজের জন্য মংগলজনক।

৫। যেহেতু জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে উপজেলা পরিষদ ভিজিট ও পরিদর্শনের জন্য বলা হয়েছে সুতরাং এসমস্ত কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা চেয়ারম্যান হতে অন্ততঃ এক ধাপ উপরে উন্নীত করতে হবে।

৬। অনেক সময় দেখা যায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে অনাস্থা পেশ করলেও কোন না কোন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে কোন ফল পাওয়া যায় না এতে কাজের ক্ষতি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭। উপজেলা পরিষদের উপর যতদূর সম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ রাখা যেতে পারে।

৮। কাজের সুবিধার জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ব্যাপক উন্নয়নধর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

উপরোক্ত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সহজ কাজ নয়, তবুও কর্মের জটিলতা এবং বিপুলতা, নিষ্ক্রিয়তার ওপর হওয়া উচিত নয়। উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়েছে বেশী আগে নয় এর পূর্ণ সফলতা দেখতে হলে আমাদেরকে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

উপসংহার

যদিও রণ্ডিনেলী এবং অন্যান্যরা বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিগতকরণ বা সরকারী হতে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কার্য বন্টন পদ্ধতি বলে মনে করেন তবুও উপজেলা পদ্ধতি যে ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার ফসল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে রণ্ডিনেলী এবং চিমা যথার্থভাবে এও বলেছেন, 'বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন কখনো দ্বন্দ্বমুক্ত নয় ; বিভিন্ন দল, উপদলের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। উন্নয়নশীল দেশসমূহে একে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি দূরীকরণের জন্য ধন্বন্তরী ঔষধ হিসেবে বিবেচনা করাও ঠিক হবে না। এর বাস্তবায়নের ফলে আপনা হতেই দক্ষ কর্মকর্তা / কর্মচারীর অভাব দূর হবে না বরং প্রাথমিকভাবে তাদের চাহিদা বেড়ে যাবে।

বহু অসুবিধা ও দূর্বলতা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ একটি উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। যদিও এ পদ্ধতিতে কিছু সমস্যা ও মত-পার্থক্য, দ্বন্দ্ব এবং কিছু মৌলিক বিষয় আছে যা গণতান্ত্রিকভাবে দূর করা সম্ভব, এবং এর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন বেআইনী কর্মতৎপরতা হতে বিরত থাকবে অন্যদিকে সরকারী নীতিমালার সংগে সংগতি রেখে একটি ন্যূনতম সীমারেখাও মেনে চলবে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে বৃটিশ স্থানীয় সরকার পদ্ধতি যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে এবং যাকে বহু কমনওয়েলথ দেশসহ অনেক দেশ অনুসরণ করছে তা কোন পরিকল্পিত ধারণার ফসল নয়। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানগুলো হতে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে গণতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধিত আকারে সমন্বিত হয়ে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং উপজেলা পদ্ধতিও কোন সময়ের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৯৮২ সনের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে উল্লিখিত কয়েকটি বিধি নিষেধ ব্যতীত উপজেলা পদ্ধতিকে একটি মডেল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা যেতে পারে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি উপজেলা পরিষদকে করতে হয়। উপজেলা পদ্ধতির ভিত্তি রয়েছে রাজনৈতিক সমন্বয় সাধনের উপর। এর দক্ষতা আংশিকভাবে প্রশিক্ষণ, সঠিক নিয়মাবলী তৈরী প্রভৃতি আমলাতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে বাড়ানো যায়। যাহোক বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরই কোন রাজনৈতিক পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে এবং একটি ভয়ংকর আমলাতান্ত্রিক সমুদ্রের মধ্যে উপজেলা পদ্ধতি একটি গণতন্ত্রের দ্বীপ হিসেবে বেঁচে থাকবে।

উপজেলা পরিষদের দূর্বলতর দিক হচ্ছে তা একটি বিভক্ত শিবির। এর পরতে পরতে দ্বন্দ্ব আমলা ও রাজনীতিবিদদের দ্বন্দ্ব, আমলাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং রাজনীতিবিদদের নিজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আমলাগণ রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করেন না। রাজনীতিবিদরাও উল্টো আমালাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মনোভাব গড়ে তোলে। এসব অসুবিধা দূর করা যাবে, যদি মনোভাবের পরিবর্তন করা যায় এবং স্বল্পকালীন সুবিধার জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যবহার করা না হয়। বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিৎ। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের সরকারী কর্মসূচী ছিল সব সময় ক্ষণস্থায়ী। যথেষ্ট সময় এবং দিক নির্দেশনা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের সফলতা আসা সম্ভব নয়। তবে গণসমর্থন আদায়ের জন্য উপজেলা পরিষদ কতটুকু স্বশাসন ভোগ করে, কতটুকু দায়িত্ববোধ এর গড়ে উঠে এবং কতটুকু নিরপেক্ষতা এ বজায় রাখে তার উপরই এর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

তথ্য নির্দেশ

1. B.C. Smith *Decentralisation*
2. G. Sabbir Cheema & Dennis A Rondinellin, *Decentralisation and Development : Policy Implementation in Developing Countries.*
3. D. A. Rodninelli, Govt. Decentralisation in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Science.*
4. Diana Conyers "Decentralisation : A Frame for Discussion" *Decentralisation, Local Govt. Institutions & Resource Mobilization* ed. Hasnat A. Hye. Comilla, BARD.
5. James W. Fesler, A Process to the understanding of Decentralisation. Journal of Politics Vol 27C 1965.
6. U. N. GHOSAL, *A History of Indian Public Life* vol-2 chapter IX.
7. A. M. M. Showkat Ali, *Politics, Development & Upazila.*
8. A. M. M. Showkat Ali, *Field Administration and Rural Development in Bangladesh.*
9. Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, *Report of the Committee for Administrative Reorganisation/Reforms.*
10. S. M. Ali, Saifur Rahman, K. M. Das, *Decentralization and Peoples Participation in Bangladesh.*
11. Atiar Rahman, *Rural Power Structure.*
12. Hasnat Abdul Hye, *Decentralisation, Local Govt. Institution & Resource Mobilisation,* BARD, Comilla.
13. Akbar Ali Khan, *Conflict and Co-ordination Problems in Upazila Administration - A Note* **"The Young Economist, BYEA Journal."**
14. Akbar Ali Khan (Translated by Aminul Islam Bhuiyan)
    বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ 'প্রশাসন সমীক্ষা' জার্নাল, বিপিএটিসি ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
15. Mohammad Faizullah, *Development of Local Govt. in Bangladesh.*
16. Mohammad Faizullah, Upazila Development Planning " Development Review" the bi-annual publication of Academy for Planning & Development vol. 1 No-2 June 1988.
17. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
18. L. R. Bhuiya, Functional Relationship and Administrative Efficiency at Upazila level ; A Seminar Paper submitted during 4th ACAD Course at BPATC.